সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাট্যভাবনা : 'পুনর্বিবেচনা' প্রসঙ্গে

মাফরুহা সিফাত*

[**সারসংক্ষেপ:** 'পুনর্বিবেচনা'-সূত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, যেসব প্রচলিত ছাঁচের ওপর ভিত্তি করে নাটকগুলো পাঠ, পুনঃপাঠ এবং বিশ্লেষিত হয়েছে, সেসব মূল্যায়ন অনেকাংশে যৌক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাতে নাট্যকারের আকর ভাবনার প্রতি পূর্ণমাত্রায় সুবিচার করা হয়নি অনেক ক্ষেত্রেই। অবশ্য সার্বিকভাবে লেখকের সাহিত্যবিচার প্রসঙ্গেও প্রায় একই কথা বলা সম্ভব। কারণ, দেখা গেছে তাঁকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনায় বেশিরভাগই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর পাশ্চাত্যবোধ ও তাত্ত্বিক চিন্তা। তবে একরৈখিক জ্ঞানভাষ্যে পর্যালোচনা করলে ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনাসমূহের মূলসুর ধরতে পারা প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে তাঁর নাটক চারটি নিয়ে যত লেখালেখি হয়েছে, সেসবে প্রধানত উঠে এসেছে নাটকগুলোর তত্ত্বকেন্দ্রিকতা ও কাঠামোনির্ভরতার আনুপাতিক পরিচর্যা। ফলে যদিও বৈশ্বিক ও দেশীয় নাট্যপ্রবাহের ধারায় তাঁর অনন্য অবস্থান সুচিহ্নিত রয়েছে বেশ দৃঢ়ভাবে, তবুও এ প্রবন্ধে অনেকটা ভিন্ন মাত্রায় অনুসন্ধান করা হয়েছে নাট্যকার ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিন্তাবিশ্বকে। মূলত কেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চারটি নাটকে প্রকরণ-ঘনিষ্ঠতার চাইতে বিষয়ভাবনার প্রাধান্য বেশি, বর্তমান প্রবন্ধে সেই উৎসমুখ উন্মোচন করা হয়েছে। একই সমান্তরালে প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কীভাবে তিনি আত্মসমীক্ষার নিরিখে *বহিপীর*, *উজানে মৃত্যু*, *সুড়ঙ্গ* ও *তরঙ্গভঙ্গ*— নাটক চারটিতে সমকাল, নিজ ভূখণ্ড ও স্বজাতির ইতিবৃত্তকে প্রকাশভঙ্গির নতুনত্বে তুলে ধরার মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর চিরায়ত কল্যাণকামী ভাবাদর্শের।]

প্রখর কালচেতনা ও প্রকৃষ্ট জীবনদর্শনের যুক্তিকে সামনে রাখলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) নাটক নিয়ে আলোচনার পথ হয়ে ওঠে সুপ্রশস্ত । কারণ, তাঁর সমগ্র বোধিসত্তার মূলে কেন্দ্রীভূত ছিল স্বদেশ, সমাজ, এবং স্বজাতি-সম্পর্কিত গভীর অনুধ্যান। গঠনকৌশলের প্রয়োজনে পাশ্চাত্য রীতিপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করলেও, সেসবের প্রতিনিধিত্ব করা ওয়ালীউল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল না কোনোভাবেই। অর্থাৎ, তিনি পাশ্চাত্যধারায় লেখতে হবে বলেই নাটক লেখেননি, বরং জীবনসত্যের বয়ানে ও স্বাদেশিকতার স্বরায়নে তাঁর নাটকগুলোকে নির্মাণ করেছেন কিছুটা তত্ত্বীয় ছাঁচে। ফলে নাটকগুলোতে অল্পবিস্তর অ্যাবসার্ডীয় ধারা (absurd), সম্প্রকাশবাদ (expressionism), কিংবা অস্তিত্ববাদ (existentialism) ফুটে উঠেছে বটে, তবে কোনোভাবেই এগুলো পুরোপুরি কাঠামো-নির্ভর নয়। এছাড়া কোন তত্ত্বীয় কাঠামোয় কতটা শিল্পসিদ্ধ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকসমূহ, সেটা পৃথকভাবে ভাবার চাইতেও বেশি জরুরি তাঁর নাটক চতুষ্টয়কে একই সূত্রে গেঁথে সমকালের সমান্তরালে বিবেচনা করা। তাহলেই

---

* প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

https://doi.org/10.62328/sp.v57i1-2.5

নাটকগুলোর মূলধারা বোঝা সম্ভবপর হবে। সুতরাং, এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য চারটি নাটক *বহিপীর*, *উজানে মৃত্যু*, *সুড়ঙ্গ* ও *তরঙ্গভঙ্গ* রচনার পেছনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৌল প্রবণতা শনাক্ত করা। পাশাপাশি তাঁর নাটক সমালোচনায় ব্যবহৃত প্রথাগত রীতিকৌশলের যৌক্তিকতা অনুসন্ধানও প্রবন্ধটির লক্ষ্য।

১.১

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দুতে সবসময়ই দাপুটে ভূমিকা পালন করেছে তত্ত্ববিচার। একথা অনস্বীকার্য, সমসময়ে তাঁর নাটকগুলোর কাঠামোই ছিল আধুনিকতম। তবে সেক্ষেত্রে নিগূঢ় দৃষ্টিতে এটাও ভেবে দেখার অবকাশ তৈরি হয়, নাটকগুলো কতটা অবয়বনির্ভর এবং কতটা বিষয়সন্ধানী। তাঁর নাটকের শিল্পরীতি নিয়ে যত আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, ওই কালের অন্য কোনো নাট্যকারের নাটক নিয়ে বোধহয় সেটা হয়নি। সেসব পরিশ্রমসাধ্য ও সতর্ক গবেষণায় সমালোচকগণ নাটকগুলোর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বকীয় অবস্থান চিহ্নিত করেছে নিঃসন্দেহে। তবে শুধু শিল্পশুদ্ধতায় ও প্রাতিস্বিক নির্মাণ কৌশলে নয়, বিষয়বস্তু সংশ্লেষেও তিনি ছিলেন সমকালের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। কিন্তু, সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে দেখা যায়, তত্ত্বকেন্দ্রিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি ওয়ালীউল্লাহ্‌র মানস-পরিভ্রমণ সূত্রে লব্ধ স্বদেশ-সমাজ-স্বজাতি বিষয়ক বোধের অনুরণনও, তাঁর নাটকগুলোর আলোচনায় সমতালে বিশ্লেষিত হওয়ার সক্ষমতা রাখে:

> শুধুই পশ্চিমা অবক্ষয়ী-সাহিত্যের বলয়ে-আটকে-যাওয়া-তৃতীয়-বিশ্বের-এক-সাহিত্যিক জাতীয় সাধারণ প্রতিভা ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন না। ঐতিহ্যসন্ধানে যে একাগ্রতায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তাই তাকে পথ দেখাত উৎসের— আমাদের জনগোষ্ঠীর এবং সাহিত্যের ফর্মেরও। (তানভীর, ২০০০: ১০২)

সেই সূত্রে তাঁর প্রত্যেকটি নাটকের বিষয়বিন্যাস যেমন পৃথকভাবে পুনর্বিবেচিত হতে পারে, ঠিক তেমনই চারটি নাটক একই সমান্তরালে বিশ্লেষিত হতে পারে তত্ত্বীয় কাঠামোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে, ভাববস্তুর আনুপাতিক অগ্রসরতা নির্ণয়ে:

> নাট্যকার বোধগম্য কারণেই তাই নিজের কালের পাঠক-দর্শকের আগ্রহ ধরে রাখার জন্যই সমকালীন সমাজ-জীবনকে তার সৃষ্টিকর্মে তুলে ধরেন। কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পরোক্ষে। সৃজনধর্মী শিল্প হিসেবে তার সামনে চ্যালেঞ্জ হলো তার উপস্থাপিত সমাজ-জীবনের ছবি যেন নিছক সোশ্যাল ট্র্যাক্ট বা কেস-স্টাডিতে পরিণত না হয়, আর বিশ্বস্ততার সঙ্গে সমকালীন সমাজের ছবি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিক কুশলতা ও জীবনদৃষ্টির গভীরতার গুণে তা যেন সমকালকে ছাড়িয়ে ভিন্ন একটা মাত্রিকতা ও ব্যাপ্তি অর্জন করতে পারে। (কবীর, ২০১১: ১৪৮)

১.২

ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ ও অনড় যুক্তিবাদী ভাবনা থেকে নির্মিত হয়েছিল পেরিক্লিস যুগের ক্লাসিক গ্রিক নাটকগুলো, এবং একই ধারা বহমান ছিল শেক্‌সপিয়রীয়, এলিজাবেথীয়সহ ইংরেজি এমনকি ফরাসি নাটকসমূহেও; প্রায় আঠারো শতক পর্যন্ত। এরপরই নানামুখী বিদ্রোহ-বিপ্লব ও অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে সংঘটিত দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে অন্যান্য সাহিত্য ও শিল্প শাখার মতো নাটকের রীতিপদ্ধতিতেও ঘটে বিপুল পরিবর্তন:

> The whole edifice of dramatic realism– problem play, thesis play, drama of ideas, didactic drama, drawing room drama, romantic-rhetorical drama, etc., all derivatives of the well-made play genre of the nineteenth century, and all rebelling against it– flourished during the late nineteenth and early twentieth centuries. Dramatic realism became a testing ground for ideas and society. (Krasner, 2012: 168)

পাশ্চাত্য বিশ্ব যখন ধ্বংস ও দুর্দমনীয় বৈনাশিকতার মুখে দাঁড়িয়ে নিরস্তিত্ব ও হতভম্ব; মানুষের জীবন যখন পরাভবের ক্ষত, শূন্যতা, ক্লান্তি ও অর্থহীন ভবিষ্যতের আশঙ্কায় জর্জরিত; এসবকে উপজীব্য করে তখন থেকে অস্তিত্ববাদী ধারায়, অ্যাবসার্ড রীতিতে, কিংবা সম্প্রকাশবাদী প্রণোদনায় রচিত হতে শুরু করে একের পর এক নাটক:

> While formal attempts at confronting man with the ultimate realities of his condition projected a coherent and generally recognized version of the truth, The Theatre of the Absurd merely communicates one poet's most intimate and personal intuition of the human situation, his own *sense of being*, his individual vision of the world. This is the *subject matter* of The Theatre of the Absurd, and it determines its *form*, which must, of necessity, represent a convention of the stage, basically different from the "realistic" theatre of our time. (Esslin, 2004: 293)

মার্টিন এসলিন থেকে ডেভিড ক্র্যানসার— পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রায় সকল সমালোচক শিল্প-সাহিত্যের 'আধুনিক' (modern) হয়ে ওঠা, 'উত্তর-আধুনিক' (post-modern) হয়ে-ওঠাকে সামাজিক বলয়বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমুখিতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমনকি ব্যক্তিপ্রধান সাহিত্যসমূহ; বিশেষ করে অ্যাবসার্ড বা এক্সপ্রেশনিস্ট ধারার সাহিত্যকে কখনও কখনও বলেছেন আপাত সংযোগবিচ্ছিন্ন ও উদ্দেশ্যহীন। অর্থাৎ, বাস্তববাদিতা, রোমান্টিকতা— এসব পেরিয়ে আধুনিকতার স্থপতিরা, সামাজিক বাস্তবতা ও ধর্মীয় ঐক্য তথা 'হ্যান্ড-মি-ডাউন' (hand-me-down) ধারণার পরিবর্তে পৃথক যুক্তিবাদ এবং চিন্তার ঐক্য মজুদ করেছিলেন; যেখানে 'ব্যক্তি' হয়ে উঠেছিল প্রধান। আর ব্যক্তির জীবনে প্রাধান্য পেয়েছিল অন্তর্গত সত্তার মূর্ত প্রকাশ:

> The modernist vanguard of the early to mid-twentieth century rejected this 'reality' concept, finding representation dubious or impossible. Avant-grade modernists critiqued realism's claim to objectivity as a false paradigm; no matter how 'objective' the artist claims to be, there is a guiding hand in the creation that influences the art object's intent; to pretend otherwise is disingenuous. (Krasner, 2016: 13)

এই ধারায় বিশ্বসাহিত্যে ইস্কাইলাস, সফোক্লিস, মলিয়ে, শেক্‌সপীয়র, বার্নাড শ, গলসওয়ারদি, ইবসেন, হাউপটম্যান, ইউজিন ও' নীল, বেরটল্ট ব্রেখট, জাঁ পল সার্ত্র, স্যামুয়েল বেকেট, হ্যারল্ড পিন্টার, অ্যাডওয়ার্ড অ্যালবি প্রমুখ চিরায়ত থেকে আধুনিক নাট্যকারদের নাট্যধারার সমান্তরালে বাংলা নাটকও যুগের প্রবাহ স্বীকার করে এগিয়েছে, হয়েছে বিবর্তিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, উৎপল দত্ত, বাদল সরকারের হাত ধরে। এদিকে গত শতকের চল্লিশের দশক থেকেই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমাজ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতায় ধীরে ধীরে স্থান করে নিচ্ছিল পূর্ব বাংলার নাট্যসাহিত্যও।

১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশি নাট্যকারদের নাটকে সমাজ বাস্তবতা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সংঘর্ষসহ নানা বিষয় ফুটে উঠেছে। নুরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ ও মুনীর চৌধুরীর নাটকগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস হয়েছে আলোকিত। তাঁদেরই প্রায় কাছাকছি সময়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাট্যপ্রতিভার বিকাশ এবং একে একে চারটি নাটকের[১] প্রদীপ্ত প্রকাশ। দ্বন্দ্বে উত্তাল সমাজসত্যের নির্মোহ ও নির্লিপ্ত প্রকাশ তাঁর নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি মনেপ্রাণে বাঙালি মুসলমানের অগ্রযাত্রা প্রত্যাশা করলেও ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং ধর্মব্যবসার বিরোধী ছিলেন বরারবই। সমসাময়িক সাহিত্যিক শওকত ওসমান, আবু রুশ্‌দ প্রমুখের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে, তাঁর রচনাগুলোর একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দেশিত হয় সাহিত্যস্বভাব ও প্রকাশভঙ্গিতে। এমনকি ঐ সময় এবং পরবর্তী সময়ের যেকোনো সফল নাট্যকার, যেমন: সাঈদ আহমদ, মমতাজউদদীন আহমদ, সেলিম আল দীন, সৈয়দ শামসুল হক, এস এম সোলায়মান প্রমুখের নাটকসমূহসহ সমগ্র বাংলাদেশি নাট্যবলয়েই তাঁর অবস্থান প্রাতিস্বিকতা চিহ্নিত।

২.

স্বদেশীয় সমাজকাঠামোয় ধনবাদী আগ্রাসনে অবরুদ্ধ মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচে নিজের মানসলোকের অস্থির ও অবিন্যস্ত ঘূর্ণাবর্তে আশ্রয় নিয়ে; সেখান থেকেই জন্ম অসংলগ্ন উদ্ভট অভিব্যক্তির। তবে একজন ব্যক্তি কখনোই সমাজবিচ্ছিন্ন নয়, তাই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়েই ব্যক্তির আচরণের মীমাংসা জরুরি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মানব মনের অবচেতন স্তরের ক্ষুদ্র পরিসরে নিহিত বৃহৎ রহস্যময় জগতের মানস-মন্থন করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন নীলিমা ইব্রাহিম (১৩৭৯: ৪৮০)। সেই ধারায় বিবেচনা

করলেও ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকসমূহের মূলভাবনা বোঝা হয় সহজতর । তাঁর নাটকের চরিত্রগুলোকে আপাত দৃষ্টিতে উন্মুলিত মনে হলেও, তাদের বহির্জাগতিক শেকড় প্রোথিত আছে সামষ্টিক কালচেতনায়। মানবজীবন ও জগৎ সম্পর্কে নিবিড় ভাবনা, নতুনের ও তারুণ্যের প্রবাহ, বিচিত্র ঘটনা ও মানুষ সৃষ্টির পেছনে ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রেরণা ছিল পূর্ববাংলার নদীমাতৃক জনপদের ইতিবৃত্ত। 'তাঁর উক্তিতে অনেক সময় ধরা পড়েছে মানবজীবন ও জগৎ সম্পর্কে গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয়...' (আবদুল মান্নান, ২০১৮: ৮৩)। সদাসর্বদা ভ্রমণশীল জীবন কাটিয়েছেন বলেই, সাহিত্যের উপাদান হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেছে নিয়েছিলেন জীবনের গতিশীলতাকে। তাঁর মানসলোকে সদা বিরাজমান ছিল নৈঃসঙ্গ্যভাবনা। তাই নাটকগুলোর নামকরণের দিকে অনুপুঙ্খ দৃষ্টিপাত করলেও পরিলক্ষিত হয় উন্মুলিত চেতনাবীজ। 'উজান', 'তরঙ্গ', 'সুড়ঙ্গ' শব্দগুলো সবই সমতল ভূমিবিচ্ছিন্ন। আর, *বহিপীরের* নামকরণে ভিন্নতা থাকলেও পুরো নাটকটির প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে একটি বজরাকে কেন্দ্র করে। সুতরাং, স্থানিক বিবেচনায় তাঁর প্রত্যেকটি নাটক সুগভীর চেতনাবাহী। তাই যেকোনো একক জ্ঞানভাষ্যে নাটকগুলো বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি:

> সমাজের প্রাচীন ও পচে যাওয়া রীতিনীতিকে প্রায়শই ব্যঙ্গ ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন ওয়ালীউল্লাহ্। তিনি একটি সুনির্দিষ্ট জীবনদর্শনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তিনি দার্শনিক ছিলেন না ব'লে, পথ বাৎলাতে পারেননি, বাৎলাতে চানওনি, কারণ তিনি তো মিশনারি নন শিল্পী। (সৈয়দ আবুল, ২০১৫: ৩৪১)

তিনি যেমন এককভাবে কোনো দর্শন প্রচার করতে নারাজ ছিলেন, ঠিক তেমনি কোনো সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রচারে একাগ্র ছিলেন; এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'পাশ্চাত্ত্য নাটকের গঠনধর্ম অনুসরণ করিলেও তাহার অন্তঃশক্তি গ্রহণ-ক্ষমতার পরিচয় পূর্ব পাকিস্তানের কোন নাট্যকারের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।' (আশুতোষ, ২০০১: ৬৯১)। তবে সমালোচকের এমন মন্তব্যও ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাট্যপ্রতিভা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। পি গুহ-ঠাকুরতার মতে (২০১৩), বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশে শুরু থেকেই প্রভাব বিস্তার করেছে পাশ্চাত্য নাট্যকলা। সুতরাং, ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক ব্যতিক্রম হবে না, তা বলাই চলে। কিন্তু, তাঁর নাটকে পাশ্চাত্য ধারার প্রভাব পড়েনি এটাও যেমন সত্য নয়; ঠিক তেমনই পাশ্চাত্যমুখী হতে গিয়ে নাটকগুলোকে তিনি আঙ্গিকসর্বস্ব করে তুলেছেন, এই মন্তব্যও পুরোপুরি যৌক্তিক নয়। 'ওয়ালী হয়তো আধুনিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবে। তবে এগুলো ও প্রয়োগ করেছে নিজ দেশের পরিস্থিতিতে।' (আন মারি, ২০১২: ৫৪-৫৫)। ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্য সম্পর্কে আন মারির এই মন্তব্যের অনুসরণে বলা যায়, ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকের বিষয়, চরিত্রগুলো উঠে এসেছে বাঙালির সমাজ ও জীবন থেকে, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেছে তাঁর নাটকের প্রধান চরিত্রগুলো। ১৯৫৪ সালের নভেম্বরে স্ত্রী আন মারিকে চিঠিতে ওয়ালীউল্লাহ্ লিখেছিলেন:

> আমার লেখা বই, আমার নাটক, আমার গল্পগুলো ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ফটোগ্রাফিক প্রতিফলন নয়, বরং এগুলো তার চেয়ে বেশি কিছু। অন্তত আমি সেটাই মনে করি। আমি যখন ধর্মীয় কুসংস্কার, মোল্লাদের হাতে গরীব মানুষের শোষণকে আক্রমণ করি, তখন আমি গোটা ব্যবস্থাটাকেই আক্রমণ করি। (আন মারি, ২০১২: ৫৫-৫৬)

এখানে, '... আমি গোটা ব্যবস্থাটাকেই আক্রমণ করি।' অংশটুকুকে তিনি নিজে 'আন্ডারলাইনে'র মাধ্যমে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু, এর কারণ কী হতে পারে? কেনই-বা ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকগুলো পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন? তাঁর স্ত্রী যেমন বলেছিলেন: 'ধর্মীয়ভাবে না হলেও সাংস্কৃতিকভাবে সে বাঙালি মুসলমানই ছিল।' (আন মারি, ২০১২: ৩২)। ওয়ালীউল্লাহ্ নিজেও তাঁর সমগ্র জীবন বাঙালি মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির চিন্তায় ব্যয় করেছেন। সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১৫: ৪৮-৪৯) বলেছেন:

> প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের নেতৃত্বে বাংলার বৃহত্তর অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে কেবল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা বলে, এই বিষয়টি যেমন তৎকালীন যেকোনো মুক্তবুদ্ধির মানুষের মতো তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল, ঠিক তেমনি হয়তো একটা স্বাধীন রাষ্ট্র পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানদের প্রতিভা বিকাশের পথকে সুগম করবে, এমন একটা বোধও তার ছিল।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে বন্ধু হৃষীকেশ লাহিড়ীকে লেখা ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালের একটি চিঠিতে।[২] সেখানে তিনি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন, কারণ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতে, তিনি মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আবার, বন্ধুকে তিনি এটাও লিখেছিলেন, দুই ভূখণ্ডের বিচ্ছেদ তাঁর জন্য দুঃখজনক। অর্থাৎ, 'বাঙালি' ও 'মুসলমান' এই দুটো বিষয়কে একীভূত করেই সম্প্রসারিত হয়েছিল তাঁর চিন্তাবিশ্ব। তাই সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেমকে (১৯৯৯: ৬৯-৭০) তিনি বলেছিলেন: 'তুমি জানো যে আমি মনেপ্রাণে বাঙালি এবং আমার প্রতিটি লেখা তার সাক্ষী দেয়।' এছাড়া, ১৯৪৩ সালে আফসারউদ্দিনকে লিখেছিলেন:

> আমরা মুসলমান। হয়তো-বা মাত্র কয়েকঘর আমরা শহরে বাস করি এবং আমাদের বাড়ি শহরে। তা ছাড়া যে-বিরাট সমাজ সভ্যতার জঞ্জাল, সে-সমাজের পক্ষে অতি আধুনিকতম সাহিত্যের তেমন প্রয়োজন রয়েছে কী? এবং সে-সাহিত্য যদি ব্যর্থ হয় তবে সে-ব্যর্থতা হবে সেই রকম— ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলা ছেড়ে [কোনো] কিছুরও মধ্যস্থতা না নিয়ে এক লাফে সূরিয়ালিজম শুরু করার-যে ব্যর্থতা। আমার তো তাই মত, তবে সেই মত খণ্ডন করতে রাজি আছি যদি শক্তিপূর্ণ যুক্তি পাই এর বিরুদ্ধে। (সৈয়দ আবুল, ২০১৫: ১৪৪)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কি আদৌ 'অতি আধুনিকতম' সাহিত্য রচনার পেছনে কোনো 'শক্তিপূর্ণ যুক্তি'র সন্ধান পেয়েছিলেন? তাঁর কালের আধুনিকতম কাঠামোতে তিনি সাহিত্য লিখেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সমালোচকদের নানা

আলোচনা সাপেক্ষে এই মত অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিতও বটে। তবে আলোচিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এটা খতিয়ে দেখা, *বহিপীর*, *উজানে মৃত্যু*, *সুড়ঙ্গ* ও *তরঙ্গভঙ্গ* নাটকগুলো কতটা স্বদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গিজাত বিষয়ভিত্তিক এবং কতটা পাশ্চাত্যমুখী কাঠামো-নির্ভর। আপাতদৃষ্টিতে দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিই অধিকাংশ সমালোচকদের রায় বেশি, এবং আগেও উল্লিখিত যে, সেটা যথেষ্ট যুক্তিসাপেক্ষও বটে। তবে কোনো কোনো সমালোচক বিষয় (content) ও গঠনশৈলীকে (structure) সাম্যাবস্থায় রেখে যাচাই করেছেন:

> বিষয়ের মধ্যে ডুবে গিয়ে নিছক গল্প বলায় তার কোনো উৎসাহ ছিল না। আবার বিষয়কে তুচ্ছ করে আঙ্গিক সর্বস্বতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতেও তিনি কখনো রাজী হননি। তার সব কয়টি রচনাতেই এর সাক্ষ্য মেলে। (কবীর, ১৯৭১: ৩)

আর, এই আলোচনায় নাটকগুলো পাঠ ও পুনঃপাঠ সাপেক্ষে এই উৎসমুখ উন্মোচনের চেষ্টা করা হবে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য জীবনঘনিষ্ঠ দার্শনিক সত্যের উচ্চারণ ও ব্যক্তিজীবনের আপাত অর্থহীনতা দেখানো হলেও, চূড়ান্ত পরিণতিতে লক্ষ্য মানুষের জয়গান গাওয়া। একই সঙ্গে এটাও তুলে ধরা হবে, আত্ম-অভিজ্ঞানের খোঁজে ও ভাবাদর্শের বয়ানে নানামুখী পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-তত্ত্বের সমাবেশ ঘটানো হলেও নাটকগুলো পুরোপুরি তত্ত্ব-নির্ভর নয়।

৩.

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছেন সমাজ ও জীবনের প্রতি গভীর দায়িত্ব থেকে। সুবিধাবাদী ও কূপমণ্ডূক সম্প্রদায়ের স্বরূপ উন্মোচন, সামন্তযুগীয় মূল্যবোধের সঙ্গে নব-জাগ্রত মধ্যবিত্ত মানসের দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিমানসের অন্তর্গত সত্তার সঙ্গে সমাজ-সংকটের দ্বন্দ্ব, রক্ষণশীল ও আধুনিকতাবিমুখ মোল্লাতন্ত্রের অসারতা দেখানো; অনিকেতচেতনা, নৈঃসঙ্গ্য, নৈরাশ্য, মৃত্যুচিন্তা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি সদর্থকতা এবং পরিশেষে বঞ্চনার শিকার প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর মঙ্গলকামনা; বিষয়গুলোই তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মতো নাটকেও। তবে তাঁর নাটকগুলো মঞ্চচাহিদাজাত বিষয় থেকে ছিল বেশ ভিন্ন। তৎকালীন পূর্ববাংলা ভূখণ্ডের সাধারণ জনগোষ্ঠীর ইতিবৃত্তকে শৈল্পিক অবয়ব ও প্রকাশভঙ্গির নতুনত্বে প্রকৃষ্টরূপে তুলে ধরেছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্‌। নাটকগুলো তাই কেবল সুনির্দিষ্ট চেতনাবাহী নয়, বরং ভিন্ন মাত্রার পরিচায়ক।

৩.১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রক্তকরবী*ও (১৯২৫) যেমন বহুবছর মঞ্চে আসেনি; ওয়ালীউল্লাহ্‌র *বহিপীরে*র মঞ্চায়ন তেমনই বিলম্বিত হয়েছিল মঞ্চসজ্জাগত ভিন্নতার কারণে। তবে তিনি ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী নাট্যকারদের নির্দেশনা-কৌশল অনুসরণ করলেও,

নাটকটির স্থানিক পরিমণ্ডল নাগরিক বৃত্তকে ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে পূর্ববাংলার নদীঘেঁষা জনজীবন পর্যন্ত। সুতরাং, এখানে নাট্যকার ওয়ালীউল্লাহ্‌র সীমাবদ্ধতা খোঁজার কোনো সুযোগ নেই। তিনি একই সঙ্গে নাট্যকার ও নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন। নাটকটির নিবিড় পাঠ, এই তাৎপর্যের খোঁজ দেয়। প্রাগ্রসর শিল্পচেতনায় নির্মোহ সমাজসত্য প্রকাশিত হয়েছে এই নাটকটিতে।

'বহিপীরের পরাভবে সামন্ত মূল্যবোধাশ্রয়ী বাংলার সমাজকাঠামো ও তার আসন্ন পতনই হয়েছে শিল্পিত।' (আবুল কাশেম, ১৩৬৮: ১৬৭)। দেশভাগের কয়েক বছরের মধ্যে যখন জমিদারি-প্রথা বিলুপ্ত হতে শুরু করে পুরোদমে, প্রায় সেরকম সময়েই রচিত হয় *বহিপীর* নাটকটি। পাশাপাশি একটি নতুন দেশের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যখন ধর্মতন্ত্র ও শাসনতন্ত্রের যোগসাজশে বিশ্বাসঘাতকতার মুখে পতিত হয় সেই দেশেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি, তাদেরই একজন হিসেবে এই শোষণ-দমন ও ধর্মব্যবসার প্রতি ভীষণ ক্ষোভ জন্মে ওয়ালীউল্লাহ্‌র। তাই পির-মোল্লাদের অসাধু আচরণের মুখোশ উন্মোচনে সাহিত্যকর্মই হয়ে ওঠে তাঁর হাতিয়ার, এই নাটকটিও ব্যতিক্রম নয়।

নাটকটি শুরু হয় একটি বজরায় হাতেম আলী ও বহিপীরের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। হাতেম আলী বজরায় করে শহরে এসেছে স্ত্রী খোদেজা ও পুত্র হাশেমকে সঙ্গে নিয়ে। স্ত্রী-পুত্রের কাছে অসুস্থতার কথা বলে দাওয়াই নিতে শহরে এসেছে জানালেও, প্রকৃতপক্ষে সে এসেছে তার জমিদারিকে সান্ধ্য আইনে পড়ে নিলামে ওঠার হাত থেকে বাঁচাতে টাকার সন্ধানে। অপরদিকে, নাটকের নামচরিত্র পেশায় পির এবং সে বইয়ের ভাষায় কথা বলে, তাই 'বহিপীর' নামে পরিচিত। তার মতে, কথ্য ভাষার ক্ষমতা নেই 'খোদার বাণী' বহন করা। নিজের 'পেয়ারা মুরিদে'র কন্যাকে বিয়ে করার পর যখন সেই কন্যা তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, তার খোঁজে বেরিয়ে ঘটনাক্রমে এসে ওঠে হাতেম আলীর বজরায়। সমাজের এই আপাত ক্ষমতাধর দুই শক্তিকে একই বিন্দুতে মিলিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ যে কৌশল অবলম্বন করেছেন, সেটি সম্পর্কে জীনাত ইমতিয়াজ আলী লিখেছেন:

> প্রগতিশীল শক্তির যখন বিকাশ ঘটে তখন মৌলবাদ ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত মূল্যবোধ নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এভাবে হয় সংঘবদ্ধ। হাতেম আলী-বহিপীরের মিলন তাই সমাজসত্য, নাট্যকারের সময় ও সমাজ সচেতনতারই রূপক। (জীনাত, ২০১৫: ১৬৮)

অন্যদিকে, এরই বিপরীতে এই নাটকে তাহেরার প্রতিবাদ ও হাশেমের তাহেরাকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে 'প্রগতিশীল শক্তি'র বিকাশের ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার:

> আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন, আপনি আমার বাপজানকে ডেকে পাঠাতে পারেন, আমার ওপর জুলুম করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাব না। আপনি আমাকে দেখেন নি, আমিও আপনাকে দেখি নি। আর আপনাকে আমি দেখতেও চাই না। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩: ২২)

পরিমিতিবোধে ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তাহেরার দ্রোহচেতনাকে যেমন তিনি গুরুত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন, ঠিক তেমন একজন নারী তখনও যে সামাজিক চাপে নিজ সিদ্ধান্তে শেষপর্যন্ত অটল থাকতে ব্যর্থ হতো অনেকটাই, তুলে ধরেছেন সেই সত্যও। পিরসাহেবের অর্থসাহায্যে হাতেম আলীর জমিদারি রক্ষা হবে জেনে, মানবিক বিবেচনায় সে বহিপীরের সঙ্গে ফিরে যেতে সম্মত হয়। তবে হাশেমের নির্ভীক সত্তার জাগরণে নাটকটির পরিণতিতে জয় হয় নবীন শক্তির:

> বুঝতে পারছি, সবার বদান্যতার পরীক্ষা চলছে, বদান্যতার জোরে জান যায় মানুষের: তার নেশায় অন্ধ হয়, বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তিও হারায়। আপনি ভুল করবেন না। আপনার সত্যপথ এটা নয়। না, আপনাকে নেশায় ধরছে। আপনি জানেন না যে, এঁরা আপনার জীবন নিয়ে খেলা করছেন। আপনি যেন দাবার গুলি, জীবন নিয়ে খেলা করছেন, বুঝতে পারছেন না সেকথা? না, না, আপনাকে আমি বাঁচাবই। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩: ৩৪)

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়। রাজনৈতিকভাবে প্রাচীন ও গোঁড়া এই দলটির বিপরীতে প্রগতিশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিজয় এক নতুন ধারার সূচনা করে। নতুনদের জয়গানের সুর তাই ধ্বনিত হয় এই নাটকেও। তবে পুরোনো শক্তি সহজে নিষ্ক্রিয় হতে চায় না বলেই বহিপীর হাতেম আলীর জমিদারি রক্ষা করার চেষ্টা করে নিজ স্বার্থে, টিকে থাকার অভিসন্ধিতে: 'ভাবিলাম দুঃখের কারণ যদি এক না হয়, তবে গভীর দুঃখগ্রস্ত দুটি লোকের মতো অপরিচিত আর কেহ নাই।' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩: ২৭)। যদিও প্রথমে তাহেরাকে ফিরে পেতে তৎপর হয়েই সে হাতেম আলীকে অর্থ প্রদান করতে চেয়েছিল:

> ভাবিলাম আমাদের দুইজনের সমস্যাকে জড়িত করিলে দুইজনের সমস্যারও হয়তো সমাধান হইতে পারে, না-হইলেও অন্ততপক্ষে দুখে মিলিত হইয়া আমরা পরস্পরের দেলে কিছুটা শক্তি আনিতে পারি। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩: ২৮)

কিন্তু, পরবর্তীকালে বহিপীর অস্তিত্ব রক্ষার্থে, ভবিষ্যতের শঙ্কায় হাতেম আলীর জমিদারি রক্ষা করতে চায়। নাটকের প্রায় শেষ দিকে তার সংলাপ সেই অর্থে যথেষ্ট সাংকেতিক।

সাহিত্য প্রকরণের দিক থেকে *লালসালু* (১৯৪৯) উপন্যাস এবং *বহিপীর* নাটক হলেও, এ দুটো সাহিত্যকর্মের পেছনে ওয়ালীউল্লাহ্র উদ্দেশ্য প্রায় একই: 'বস্তুত, বহিপীর *লালসালু* উপন্যাসের মজিদ-চরিত্রের ভিন্নতর রূপায়ণ।' (সৈয়দ আকরম, ১৯৮৮: ৮০)। *লালসালু* আগে লেখা বলে, সেখানে শেষাবধি ধর্মান্ধ মজিদকে অবিচল থাকতে দেখা গেছে পুরোনো বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে। অন্যদিকে *লালসালু* প্রকাশের পর বেশ কয়েকবছর পেরিয়ে যাওয়ায়, এবং এর মধ্যে সমাজে একটা নতুন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হতে দেখে, সেই ধারায় বহিপীরকেও ওয়ালীউল্লাহ্ বাধ্য করে

তুলেছিলেন নতুনকে স্বীকৃতি জানাতে । কারণ, জনসমাজে তখন এই প্রবহমানতাই চলছিল। যেখানে পুরোনো পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, কিন্তু দিকে দিকে শোনা যাচ্ছিল নতুনের আহ্বান:

> এতক্ষণে ঝড় থামিল। তাহারা গিয়াছে, যাক। তাছাড়া-তো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কী করিয়া তাহাদের ঠেকাই। আজ না হয় কাল যাইবেই। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩: ৩৫)

ঐতিহাসিক নন, কিংবা ইতিহাস প্রচার ওয়ালীউল্লাহ্‌র দায়িত্বও নয় বলে, তাঁর কোনো নাটকে সরাসরি এমন কোনো ধরনের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না, যেটা সমাজের কেন্দ্রে তখন আলোড়ন তুলেছিল। তবে কেন্দ্র আলোড়িত হলে পরিধি জুড়ে যে প্রকম্পন সৃষ্টি হয়, তাঁর একটা আঁচ ঠিকই উপলব্ধি করা যায়, নাটকগুলোর নিবিড় পাঠে।

৩.২

অ্যাডওয়ার্ড অ্যালবির অধিকাংশ নাটকের মতো ওয়ালীউল্লাহ্‌র *উজানে মৃত্যু* নাটকের চরিত্ররাও নামহীন ও উপাধিধারী। তবে স্যামুয়েল বেকেটের *ওয়েটিং ফর গডো* (*Waiting for Godot* : ১৯৫৩) নাটকের ভ্লাদিমির ও এস্ট্রেগনের মতো সীমাহীন ও অর্থহীন প্রতীক্ষা ছিল না এই নাটকের নৌকাবাহকের। তাই মার্টিন এসলিন (২০০৪) সংজ্ঞায়িত অ্যাবসার্ড নাটকের শ্রেণিতে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করা যায় না এই নাটককে। নাটকের নৌকাবাহক চরিত্র তার লক্ষ্য সম্পর্কে জানত। সে খোঁজ করছিল গভীর সত্যের ও জীবনের অর্থবোধকতার। জগৎ সংসারের নানা ভ্রান্তিই তাকে প্রভাবিত করেছিল অনন্তযাত্রায়: 'না, কোথাও-না কোথাও যেতেই হয়। এমন এক সময় আসে যখন না গিয়ে আর উপায় থাকে না।' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩: ৪১)। অন্তর্গত অস্থিরতা ও গতিশীল সময়ের ছাপ পড়েছে নাটকটির সংলাপে। দেশীয় প্রতিবেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক নাট্যচিন্তার এই সংশ্লেষ ও সমন্বয় বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্বকীয় মাত্রাচিহ্নিত। কালের নিঃসঙ্গ প্রয়াসে এ নাটকটি শিল্প প্রকর্ষতায় উত্তীর্ণ হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল কালের অনতিক্রান্ত সৃষ্টিতে:

> আধুনিক জীবনের সর্বাত্মক অর্থহীনতা, শূন্যতা, ক্লান্তি, নৈরাশ্য এবং অন্তহীন প্রতীক্ষা ওয়ালীউল্লাহ্‌র *উজানে মৃত্যু* নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়। এখানেও তিনি অ্যাবসার্ড আবহে চেতন নয়, অবচেতনার জগতে সন্ধানী আলো ফেলেছেন এবং তুলে এনেছেন শুভ্রতা ও কল্যাণের সঙ্গে মলিনতা ও অকল্যাণের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত বিপর্যস্ত মানুষের অন্তর্জগতের স্তরীভূত চিত্র। (বিশ্বজিৎ, ২০১৪: ৪২৩)

এদিকে কবীর চৌধুরী (১৯৮৫) বাংলাদেশের অ্যাবসার্ড নাটক নিয়ে আলোচনায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটককে গুরুত্বসহ বিবেচনা করেছেন; যদিও সেখানে অনুপস্থিত ছিল *উজানে মৃত্যুর* উল্লেখ। আবার, আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১৮: ৯৪-৯৫) একে

আখ্যায়িত করেছেন প্রতীকী নাটক হিসেবে । অর্থাৎ, বিভিন্ন সময়ে নাটকটি নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন সমালোচকগণ। তবে, ভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর *তরঙ্গভঙ্গ* নাটকটি নিয়ে বলতে গিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আফসোসের সুরে মমতাজউদদীনকে (১৯৭৫) জানিয়েছিলেন, *উজানে মৃত্যু* নাটকটির ইতালি ও ফরাসি অনুবাদ সেসব দেশে মঞ্চস্থ হলেও, নিজের দেশে মঞ্চস্থ হওয়া তো দূরে থাক, সেই সময় অনেকেই সেটা ঠিকমতো পড়ে পর্যন্ত দেখেননি, আর পড়লেও অনুধাবন করতে পারেননি যথাযথভাবে। অথচ তিনি, এই ধারায় আরও আটটি নাটিকা লিখবেন বলে ভেবেছিলেন।

সুতরাং, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দীর্ঘায়ু হলে *উজানে মৃত্যু*র মতো নাটক হয়তো আরও লিখতেন। কিন্তু, সেই সুযোগটা হয়নি বলে ভিন্নধারার এই নাটকটিকেই বহুধাবিভক্ত বিশেষণে সিদ্ধ করার পূর্বে ভেবে দেখা প্রয়োজন, এটি রচনার পেছনে নাট্যকারের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল কি না। পাশাপাশি, কেবল কিছু খাপছাড়া সংলাপের সমাবেশ ঘটেছে বলেই একে পুরোপুরি অ্যাবসার্ড নাটক বলা যৌক্তিক কি না, এটাও বিচার্য। অ্যাবসার্ড নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মৃত্যুচিন্তা। যাকে সার্ত্রের ভাষায় অভিহিত করা যায় এভাবে:

> But death thus recovered does not remain simply human; it becomes mine. By being interiorized it is individualized. Death is no longer the great unknowable which limits the human; it is the phenomenon of my personal life which makes of this life a unique life-that is, a life which does not begin again, a life in which one never recovers his stroke. Hence, I become responsible for my death as for my life. Not for the empirical and contingent phenomenon of my decease but for this character of finitude which causes my life like my death to be my life. (Sartre, 1993: 532)

অতএব ক্ষয়িষ্ণুতা, আতঙ্ক, বিহ্বলতা ও বিপর্যস্ততা প্রভৃতি একরাশ অনুভূতির সমন্বয়ে মানুষের অন্তর্গত সত্তার উপস্থাপন উদ্ভট হতে পারে, তবে অসত্য নয়। অসত্য নয় মৃত্যুচিন্তাও। তাই নৌকাবাহকের মৃত্যুর প্রস্তুতি ও পরিণতির মধ্যেও প্রোথিত আছে লেখকের সামষ্টিক কল্যাণচিন্তা: 'মৃত্যুর বিষয়টিকে একটি নতুন মানবিকবোধে বিচার করার যে দৃষ্টিভঙ্গি ওয়ালীউল্লাহ্র কাছ থেকে আমরা পাই তা নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত।' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৭: ১৩৩)। সুতরাং তিন ছেলে, স্ত্রী ও জমিজমা সব হারিয়েও নৌকাবাহক যেভাবে কোথাও না কোথাও পৌঁছাতে প্রত্যয়ী হয়েছে, এটিও নাট্যকারের মানবিক সত্তার পরিচায়ক:

> আর আমি ভেবেছিলাম আমি শুধু পালিয়ে যাচ্ছি। এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে। জানি না নৌকাটা কেন টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু মানুষ যখন এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে যায় তখন কিছুতেই কোনো অর্থ থাকে না। অথবা হয়তো নৌকাটির জন্য মনে হচ্ছিল তবু কোথাও যাচ্ছি। সব জেনেও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া মুশকিল। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩: ৪৯)

নৌকাকে টেনে নিয়ে কোথাও যাওয়ার পুরো প্রক্রিয়ায় নানা বিভঙ্গতায় নৌকাবাহকের অন্তর্বাস্তবতার যে অসংগতি প্রকাশিত হয় পারম্পর্যহীন সংলাপে, সেটি মূলত বহির্লোকের (outer reality) সঙ্গে অন্তর্লোকের (inner isolation) ক্রমাগত দ্বন্দ্বের ফলাফল। সে জানত তাকে কী করতে হবে, তবে কীভাবে সেটা সে শুরু করবে, সেই দ্বন্দ্বই প্রকাশিত হয়েছে পুরো নাটক জুড়ে। সচেতন লেখক ওয়ালীউল্লাহ্ নৌকাবাহকের চরিত্রটি বাছাই করেছিলেন সতর্কভাবে। একজন সাধারণ নৌকাবাহক সবসময়ই গতিশীল। জীবনে স্থবিরতা নয়, গতিশীলতার দিকেই ছিল ওয়ালীউল্লাহ্র সার্বিক রায়। পটভূমি হিসেবে গ্রামবাংলার চিরায়ত নদীমাতৃক জনপদ ছিল নাটকটির মূল উপজীব্য। তাছাড়া, নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাদা পোশাক ও কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তিদ্বয়ের বিচরণের বিষয়টাও অর্থহীন বা উদ্দেশ্যহীন নয় পুরোপুরি। বেশ কিছু সংলাপেই তার প্রমাণ মেলে:

> সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ না, তাকে আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। তা যা হোক। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তুমি যখন বলছ সেখানে কিছু আছে তখন নিশ্চয়ই সেখানে কিছু আছে। তাছাড়া, কোথাও কিছু যদি না থাকে তবে তুমি এমনভাবে নৌকা টেনে বেড়াবে? এমন অর্থহীন কাজ তুমি করবে কেন। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩: ৫০-৫১)
>
> ...
>
> কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি ॥ এখনো সে কোথাও যাচ্ছে। কিন্তু কোথায়, তা প্রয়োজনীয় নয়। শুধু এখন নয়, আগেও প্রয়োজনীয় ছিল না। কোথায় তার যাত্রা অবশেষে শেষ হবে বা আর কয় কদম বাকি আছে— সে-সব কথাও কিছু আর আসে-যায় না। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩: ৫১)

এভাবে নাটকে 'সাদা' ও 'কালো'র যে দ্বন্দ্ব, সেটাকে মাঝেমধ্যে অর্থহীন ও অসংলগ্ন মনে হলেও, মূলত কোনোভাবেই এ সংকট আরোপিত নয়। মানবজীবনের দ্বৈতাবস্থা প্রকাশে 'সাদা' বা 'কালো'য় ভাগ করে ফেলার প্রবণতা তো চিরকালিক! তাই আধুনিকমনস্ক লেখক ওয়ালীউল্লাহ্ যদি পাশ্চাত্য ধারা পুষ্ট হয়ে লেখেন, তবে সেজন্য তাঁর উচ্চ প্রশংসাই প্রাপ্য। কোনোভাবেই একবাক্যে এই মীমাংসা করা উচিত হবে না যে, তিনি পাশ্চাত্যের অনুকরণে নাটকটি লিখেছেন।

গূঢ়ার্থ বিশ্লেষণে বলা যায়, তৎকালীন পূর্ববাংলায় বোধবিশিষ্ট যেকোনো মানুষের অবস্থাকেই নৌকাবাহকের দশার সঙ্গে মেলানো সম্ভব। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন ও সামন্তবাদী শোষণ হ্রাস পেতে না পেতেই ক্রম ঘনায়মান নব্য ঔপনিবেশিক শাসনের বিপরীতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষকালে সমাজসচেতন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনও হয়েছিল আলোড়িত। কিন্তু, সামষ্টিক গণচেতনায় নশ্বরতার মধ্যেও মানুষ সম্ভাবনাকে খুঁজতে শুরু করেছিল। নাটকে কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তির ভাষায়: 'সাংঘাতিক লোক। চারধারে অর্থহীনতা, তবু তার কাছে কিছুই অর্থহীন নয়। তার বিশ্বাসকে অটুট

রাখবার জন্য সে সবকিছু করতে প্রস্তুত।" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩: ৪৪)। চেতনার এ ধারাটিকেই ব্যক্তির মাঝে কেন্দ্রীভূত করে সত্য-অসত্য, ভালো-মন্দ, ইতি-নেতি, উচিত-অনুচিতের আপেক্ষিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন *উজানে মৃত্যু* নাটকটিতে।

৩.৩

সুড়ঙ্গ আয়তনে নাতিদীর্ঘ হলেও, সুগভীর অর্থগত ব্যঞ্জনায় পরিলক্ষিত হয় ওয়ালীউল্লাহ্‌র অনিন্দ্য নাট্যনির্মিতি গুণ। সমকালকে ধারণ করে তিনি সবসময় সাহিত্যের নানা উপাদানে তা প্রকাশ করেছেন, কারণ তিনি আদ্যোপান্ত সাহিত্যিক। তাই কোনো বিশেষ তত্ত্বে তাঁর নাটকগুলো মুড়িয়ে রাখেননি, বরং বিষয়কে প্রকাশের প্রয়োজনে স্বভাবজাত সাহিত্যিক ঢঙে একেকটা নাটকে একেক ধরনের শিল্পাঙ্গিকের ধাঁচ গ্রহণ করেছিলেন। নিজস্ব নাট্যবিশ্ব নির্মাণকল্পে, সাহিত্যিক হিসেবে বৈচিত্র্যময় নিরীক্ষাধর্মী মনোভাবের প্রতিফলনে তিনি ক্রমশ হয়ে উঠছিলেন ঐকান্তিক। নিজ জনগোষ্ঠীর রূপকার ও ঐতিহ্যজিজ্ঞাসু লেখক ওয়ালীউল্লাহ্‌ 'সুড়ঙ্গ' নামকরণের মধ্য দিয়েই তাঁর নিরীক্ষা-প্রবণতাকে শিল্পশুদ্ধতায় রূপ দিয়েছেন। তাই শুধু আপাত বিচ্ছিন্ন এবং পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীন সংলাপ আছে বলেই এই নাটককে পুরোপুরি অ্যাবসার্ড কিংবা রূপকধর্মী কোনোটাই বলা যৌক্তিক নয়।

ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রচারসর্বস্ব ও স্লোগানধর্মী লেখক ছিলেন না। কিন্তু, কালের দায় এড়ানো তাঁর পক্ষে সবসময়ই অসম্ভব ছিল, এবং তিনি এড়াতেও চাননি। এছাড়া সাহিত্যিক হতে গিয়ে ঐতিহাসিক কিংবা সাংবাদিক হয়ে ওঠারও পক্ষে তিনি ছিলেন না। তাই স্বজাতি ও স্বসমাজের প্রতি গভীরতর দায়বোধের তাড়নায় অতি সতর্ক লেখক ওয়ালীউল্লাহ্‌ অনেকসময়ই সত্য প্রকাশে আশ্রয় নিয়েছেন রূপক-প্রতীকের। *সুড়ঙ্গ* নাটকটি তাঁর সেই চিন্তাসূত্রের অন্যতম প্রকাশ। অধিকাংশ সমালোচকই নাটকটি নিয়ে আলোচনা করেছেন অতি সংক্ষেপে ও একরৈখিক বিশ্লেষণে, এবং সেই রাস্তাটা অনেকটা দেখিয়েছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্‌ নিজে। ১৯৫৫ সালে প্রথম প্রকাশিত এই নাটকটি নিয়ে নিজস্ব ব্যাখ্যায় ১৯৬২ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে বসে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাংশে তিনি লিখেছিলেন, এটি কিশোর পাঠ্য নাটক এবং যে তরুণেরা সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে বিচলিত নয়, তারাও এটি পাঠে আমোদ বোধ করবেন বলে তিনি আশা রাখেন। সুতরাং, লেখক যখন নিজেই এটিকে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে লেখা বলেছেন, নাটকের গতিপথটি ধরতে পারা তখন হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত সহজতর। তবে নাট্যকার এটাও বলেছিলেন, নাটকটি পাঠে তরুণেরাও আমোদিত হবেন। এই বিষয়টিকে ধরে এগোলে, নাটকের একটি ভিন্নমাত্রিক পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কার করা সম্ভব। ওই সময়ের দেশীয় প্রেক্ষাপটে তরুণদের ভূমিকা চিন্তা করলে, এটি ধারণা করা অসম্ভব নয়, নাটকটিতে তিনি কিছুটা হলেও কোনো বিশেষ তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বিশেষ করে এর সংলাপগুলো নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, এগুলো কোনোভাবেই উদ্দেশ্যহীন নয়।

রেজ্জাকের মেয়ে ও নাটকের প্রধান চরিত্র রাবেয়া বিয়ের আগে হঠাৎই অসুস্থতার ভান শুরু করে। তবে তা সে কেন করে, সেই উদ্দেশ্য নাট্যকার নাটকটিতে সুস্পষ্ট করেননি। কিন্তু, পুরো নাটকে খাটে শুয়ে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নানা চরিত্রের সঙ্গে রাবেয়ার যে কথোপকথন, তাতে তাকে একজন প্রবল সমাজ-নিরীক্ষকের সমীপবর্তী বলেই মনে হয়। এদিকে তাকে সুস্থ করে তুলতে রেজ্জাক যখন ফকিরবেশী কলিমকে নিয়ে আসে, সেও তখন রাবেয়াকে যা বলে, সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে নিছক নাটকের প্রয়োজনে লেখা সংলাপ মনে হলেও; যুগে যুগে সকল স্বার্থান্বেষী মানুষের মনোভাব এসবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়:

> কিন্তু তুমি ঘুমাও। তোমার গায়ে পালকের আঁচড় পর্যন্ত পড়বে না। তুমি ভান করছ, আমিও ভান করছি। দু-জনের কর্মপন্থা এক, অথচ উদ্দেশ্য একেবারে ভিন্ন। অতএব দু-জনের স্বার্থে সংঘর্ষ হবার কোনোই কারণ নাই। একজন চোখ বুজে শুয়ে থাকবে, আরেকজন আপন মনে কাজ করে যাবে। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩: ৬১)

কলিমের এ উক্তির সমান্তরালে যদি ওয়ালীউল্লাহ্র দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিস্থাপন করা যায়, তাহলে বোঝা সম্ভব, সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণিগুলোর মধ্যে নানামুখী স্বার্থোদ্ধারের প্রয়োজনে করা আঁতাতের বিষয়টির প্রতিই যেন নাট্যকার ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। কিন্তু, রাবেয়ার ভূমিকা এখানে সমাজকে ব্যঙ্গবিদ্রূপকারীর, হয়তো নাটকটিতে সে লেখকেরই প্রতিনিধি। সে বুঝতে পারে চাচাত ভাই কলিম তার ঘরে প্রবেশ করেছে গুপ্তধনের লোভে। এও বোঝে, শুধু কলিম নয়, কলিমের এক বন্ধুও সেই গুপ্তধনেরই খোঁজে অন্যদিক থেকে সুড়ঙ্গে প্রবেশের চেষ্টা করছে। তাকে উদ্দেশ্য করে রাবেয়া বলে:

> দু-দিন ধরে আপনার সুড়ঙ্গ কাটা শুনেছি আর ভেবেছি আপনার কথা। আপনি নিশ্চয় কলিম ভাইয়ের বন্ধু, যার সঙ্গে গুপ্তধনের লোভে নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মানে তাকে নকল নক্শা দিয়ে নিজে আসলটা রেখে দিয়েছেন। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩: ৬৫)

নাটকে ব্যবহৃত 'সিন্দুক', 'গুপ্তধন' কিংবা 'সুড়ঙ্গ' প্রভৃতি শব্দগুলো সাংকেতিক; অর্থ, মুনাফা ও ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত। কল্যাণকামী জীবনস্রোতে এসবের প্রকৃত মূল্যহীনতা নির্দেশ করতে ওয়ালীউল্লাহ্ রাবেয়ার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন, তাদের বাড়িতে থাকা গুপ্তধনের জনরবটি মিথ্যা।

ক্ষমতালোভী ও মুনাফাভোগী মানুষেরা নিজেদের স্বার্থ কায়েমে বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও ছাড়ে না। এ বোধ তাদের থাকে না যে, মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান হওয়া নয়। কলিম ও তার বন্ধুর চরিত্রটিকে তৎকালীন পশ্চিম

পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির লোভী ও স্বার্থান্ধ আচরণের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। যাদের প্রতি প্রায় প্রত্যেকটা উক্তিতে ঝরে পড়েছে রাবেয়ার ক্ষোভ, তবে তির্যক স্যাটায়ারের (satire) ভঙ্গিতে। তাই কলিমকে যখন সে জানায় সিন্দুকের খোঁজে কেউ সুড়ঙ্গ কাটছে, রাগান্বিত কলিমকে একই সঙ্গে সে যা বলে, তার সারাৎসার আঁচ করতে পারলে যেকোনো সমাজসচেতন মানুষের জন্যই তা হাস্যরসের জোগান দেয়:

> এত অধীর হচ্ছেন কেন? যে-লোক আজ দু-দিন ধরে মাটি কেটে-কেটে সুড়ঙ্গ বানিয়ে তিল-তিল করে এগিয়ে আসছে, তাকে অন্ততপক্ষে সিন্দুক পর্যন্ত পৌঁছতে-তো দিন। না হলে তার সমস্ত শ্রমই পণ্ড হয়ে যাবে যে! (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩: ৬৪)

অপরদিকে, কলিমের বন্ধু যুবকটিকেও সে পালাবার পথ করে দিয়ে যা বলে, তা একই সঙ্গে কায়েমী স্বার্থবাদী ও ধর্মান্ধদের মুখে চপেটাঘাতের শামিল:

> শিগ্‌গির, শিগ্‌গির বেরিয়ে আসুন; এই আপনার পালাবার একমাত্র সময়। ওখানে কলিমের আলখাল্লা আর দাড়ি পড়ে আছে, তাই পরে এখুনি পালিয়ে যান। ফকিরের বেশ দেখলে কেউ আপনাকে ধরবে না, সবাই ভাববে আপনিই ফকির। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩: ৬৯)

পাশাপাশি নাটকের শেষপর্যায়ে ডাক্তার খাটের তলায় লুকানো যুবককে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যখন রাবেয়ার কাছে তার পরিচয় জানতে চায়, সেটি প্রদানে রাবেয়ার উচ্চারিত কথায় সমাজের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা মোল্লাতন্ত্রের প্রতি তার বিদ্রূপ প্রকাশিত হয়:

> সে ছিল সুড়ঙ্গের জীব। দীর্ঘ দশ বছর সুড়ঙ্গের মধ্যে একাগ্রভাবে এবাদত করার পর মাত্র সে ঐশী অবস্থা লাভ করেছে। সে-সব উচ্চমার্গের কথা আপনি বুঝবেন না। ডাক্তারি বইতে ও-সব লেখা থাকে না। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩: ৬৯)

শুরু থেকে শেষপর্যন্ত নাটকের আবহে কখনও কমেডি নাটক বা কখনও নকশাজাতীয় রচনার আবহ পাওয়া যায়। তবে, নিছক বিনোদনের অভিপ্রায়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ কিছু লিখবেন কিনা, সেই বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ। কিন্তু, যদি সেটা লিখেও থাকেন তাহলে তত্ত্ববাহী নাটকের বিষয়টা খারিজ হয়ে যায়। কারণ, অ্যাবসার্ড জাতীয় নাটকের উদ্দেশ্য আমোদ প্রদান নয় কখনও । হয়তো সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকলে, তাঁর মুখেই নাটকটি রচনার পেছনে বিস্তারিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যেত। আপাতত সেটি সম্ভবপর নয় বলেই, নাটকটি পুনঃপাঠ, এবং অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের দিকেই মনোযোগী হতে হয়। হয়তো অন্য তিনটি নাটকের মতো ধারালো কোনো চেতনা এখানে প্রকাশিত নয়, গঠনকৌশলটিও বেশ সাদামাটা। তবে প্রকৃতপক্ষে, একজন প্রকৃষ্ট সমাজসচেতন চিন্তানায়কের পক্ষে পুরোপুরি দর্শনহীন কোনো সাহিত্যসৃষ্টি কখনোই সম্ভবপর নয়।

৩.৪

বহিপীর-পরবর্তী সময়ে কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) এবং নাটক *তরঙ্গভঙ্গের* মধ্যে চেতনাগত সাযুজ্য ভীষণভাবেই পরিলক্ষিত হয়। *বহিপীর* পর্যায়ে তিনি সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাই কয়েকবছর পরে তিনি যখন *তরঙ্গভঙ্গ* লিখেছেন, তখন সমাজ এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিছুটা হলেও। তবে এটা চিরায়ত সত্য, সমাজের বাহ্যিক কাঠামোয় কিছুটা পরিবর্তন আসলেও প্রান্তে বসবাসকারী মানুষদের জীবনে সেই পরিবর্তনের কোনো উপযোগিতা লক্ষ করা যায় না। এই নাটকে সেই সত্যকেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন বিচারব্যবস্থার অসারতা প্রমাণসাপেক্ষে।

মানুষের অন্তর্গত সত্তার চূর্ণ ও বিভঙ্গ ভাবনার রূপায়ণে *তরঙ্গভঙ্গ* সম্প্রকাশবাদী হয়ে উঠেছে। অগাস্ট স্টিনবার্গের *আ ড্রিম প্লে* (*A Dream Play* : ১৯৫৩) নাটকের সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে এই নাটকের স্বপ্নদৃশ্যের । আবার, নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র জজ সাহেবের অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে সার্ত্রে কথিত মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতিতে (boarder line situation)। *চাঁদের অমাবস্যার* যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর মতো যেমন নাটক *তরঙ্গভঙ্গেও* জজসাহেবের মানস-পরিব্রাজনার পরিচয় পাওয়া যায়, ঠিক তেমন *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) উপন্যাসের মুহাম্মদ মুস্তফা চরিত্রের পরিণতির মতো এ নাটকটিতেও আত্মহত্যা করে জজসাহেব:

> ... বন্দীচেতনার অস্তিত্ব ও তার পরাজয়ই এ-নাটকের (তরঙ্গভঙ্গ) প্রতিপাদ্য।...সেজন্য দেখি আত্মতদন্ত, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণই এখানে মুখ্য, কোন রকম সক্রিয় সংঘাত বা কার্য-কারণ ঋদ্ধ আচরণ নয়।... সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এখানে inner reality — বস্তুর অন্তর্সত্তাকে আবিষ্কারে উৎসাহী। (বেগম আকতার, ১৩৮৯: ৩৭-৩৮)

নাটকটির এরূপ সম্প্রকাশবাদী বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি বেগম আকতার কামাল (১৩৮৯ : ৪২) বলেছেন: 'অবচেতনের দৃশ্যেও আছে যুক্তিবশ্যতা। কোথাও পারম্পর্যহীন, অর্থহীন সংলাপ নেই।' এসব বিশ্লেষণ মাথায় রেখে একথা বলা সম্ভব, ওয়ালীউল্লাহ্ বিশ্বসাহিত্যের উপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন নিজ দেশের সাহিত্যকে। তাই প্রকাশোপযোগী কৌশল হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তৎকালীন বিশ্বসাহিত্যের জনপ্রিয় ধারাকে, যেখানে মানুষের বহির্লোকের চাইতে অন্তর্লোক হবে বেশি সুস্পষ্ট। এছাড়া, ব্যক্তির অন্তর্জাগতিক দ্বন্দ্ব ঠিক যেমনটা থাকবে, একদম সেভাবেই তা সম্প্রকাশিত হবে সাহিত্যে। এমনকি সেই প্রকাশ কিছুটা অসংলগ্ন হলেও। বাস্তবতাবাদী (realistic) সাহিত্য ধারার বিপরীতে এভাবেই জন্ম নিয়েছিল সম্প্রকাশবাদী ধারা, যার সঙ্গে অ্যাবসার্ডিজমেরও কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে: 'Expressionism undermined the perceived comfort zones of expectations, highlighting moral rankness in both form and content.' (Krasner, 2012: 166)। তবে বিশ্বসাহিত্যের ধারার সঙ্গে তাল মেলাতে হবে বলেই বায়বীয় ঘটনা ও

চরিত্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়নি ওয়ালীউল্লাহ্‌কে, বরং ঘটেছে উল্টোটাই। তাই আধারের থেকে আধেয়ই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের আমেনা চরিত্রটি তৎকালীন সমাজের শ্রেণিবৈষম্যে নির্যাতিতার প্রতীক। সন্তান হত্যার দায়ে যে নারীর বিচার প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নাটকটির প্রেক্ষাপট:

> কেন কাজটি করেছে তা বড় একটা রহস্যের কথা নাকি? অতি দরিদ্র মেয়ে। স্বামী বেঁচে নাই, কোনো রোজগারের পথ নাই, অথচ ঘাড়ে চার-চারটে সন্তান। একদিন সহ্য না-করতে পেরে সে কোলের শিশুটাকে গলা টিপে মেরে ফেলে। বলতে গেলে নেহাতই সাধারণ ঘটনা। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩: ৮৪)

নাটকের ভিখারিণী চরিত্রটি আমেনার নির্দোষিতা প্রমাণে উপরিউক্ত সংলাপের মতো একের পর এক সংলাপ উচ্চারণ করে গেছে পুরো নাটকের শেষপর্যন্ত। চরিত্রটি ওয়ালীউল্লাহ্‌ গড়ে তুলেছেন বাংলা নাটকের বিবেক এবং গ্রিক নাটকের কোরাসের সমন্বয়ে, সময়ে-অসময়ে যে সত্যকে তুলে ধরে। আর আমেনার নৈঃশব্দ্য ভীষণভাবে প্রতীকী, উচ্চারিত শব্দের চাইতেও শক্তিশালী।

নাটকটিতে স্পষ্টত দুটো প্রবাহ: প্রথমত, ধর্মতন্ত্র যেভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে শাসনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং দ্বিতীয়ত, এক শ্রেণির মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ এ জোটের মাঝখানে পড়ে কীভাবে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। সেই বিবেচনায় *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসের একজন আরেফ আলীর সঙ্গে একজন জজের কোনো পার্থক্য নেই। আবার, উপন্যাসটির বাহ্যিক ক্ষমতাধর চরিত্র দাদাসাহেবের সঙ্গে এই নাটকের আবদুস সাত্তার নেওলাপুরীরও নেই কোনো তফাৎ। তবে, জজের দায়িত্ব এবং সংকট দুটোই যুবক শিক্ষকের থেকে বেশি ছিল। কারণ, বিচারব্যবস্থার মাঝখানে বসে, সেই ব্যবস্থার বিরোধিতা করা একই সঙ্গে দুঃসাহসিক এবং অন্তর্দ্বান্দ্বিক। যা মাঝেমধ্যেই ফুটে উঠেছে নানা স্বরে:

> যে সবকিছু দেখতে পায় সে-ই ঠাট্টা করতে পারে। তবে সুবিচারের গোড়ার কথা সন্দেহ। যা সে দেখতে পায় তা সে বিশ্বাস করে না। সে জানে, সবকিছু সে দেখতে পারছে না। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩: ৯৬)

আবার,

> আমিও অনেক জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারে স্বাক্ষর দিয়েছি। আমারও হাত কাঁপে নাই। স্বাক্ষর হল আঙ্গুলের কীর্তি: অন্তরের কথা কি সব সময়ে তাতে প্রকাশ পায়? তবে জানতাম না। তখন সন্দেহ ছিল না। জানা না-জানার যেখানে মিলন হয় সেখানেই সন্দেহের জন্মস্থান। অন্তর বেদনারও শুরু হয় সেখানেই। কিন্তু তখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম। দৃঢ় বিশ্বাসীর কখনো হাত কাঁপে না। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৩: ১১১)

সেজন্যই শর্তের ঘেরাটোপে বন্দি সমাজব্যবস্থায় জজসাহেব ন্যায়বিচার প্রদানে অসমর্থ ও ব্যর্থ হয়ে শেষপর্যন্ত আত্মহননের মাঝে মুক্তি খুঁজে নিয়েছিল। আবদুস সাত্তার

নেওলাপুরীর ভাষায়: 'আহা! একাকী প্রান্তর অতিক্রম করতে চেয়েছিল, দড়ির বন্ধনে সে-যাত্রার অবসান ঘটেছে।' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩: ১১৭)। এ নেওলাপুরীরা সমাজের সে-শ্রেণি, যাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে নিজেকে উপস্থাপনে ব্যর্থ হয় অস্তিত্বকামী মানুষেরা। নিরাশায় নিমজ্জিত হয়ে ভোগে আত্ম-পরাভবের যন্ত্রণায়। অপরদিকে, নেওলাপুরীর মতো মানুষগুলো সমাজের কেন্দ্রে বসে ধর্মের লেবাস গায়ে মেতে থাকে আত্ম-প্রপঞ্চে:

> শুধু আজ নয়, আপনার দরবারে হাজির হবার সৌভাগ্য আমার বহুবার হয়েছে। দিন দুনিয়ার আমার খেয়াল নাই, খোদার কাজে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু সমাজের মধ্য থেকে যখন কর্তব্যের ডাক আসে তখন তা অবহেলা করতে পারি না। খোদার রহমতে আশে-পাশে আমার কিছু সুনামও আছে। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩: ৮০)

তবে এসব মানুষ নিজেকে এবং অন্যদের নানাভাবে মোহাচ্ছন্ন করে রাখলেও শেষ জয়ের হাসিটা হাসতে পারে না। পারেনি নেওলাপুরীও। তাই আমেনার খুন ও বিচারকের আত্মহত্যার পর জয়ের পরিবর্তে তার অতৃপ্ত মনে জন্ম নেয় এক অদ্ভুত ভয়। এখানেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমাজবীক্ষণের পরিচয়।

মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্বেগ ও নিরস্তিত্বের যাতনাকে চিত্রকর্মে প্রকাশ করে সম্প্রকাশবাদী চিত্রশিল্পী হিসেবে শিল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন এডওয়ার্ড মুঙ্ক। তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি *দ্য স্ক্রিমের* (*The Scream*: ১৮৯৩) পেছনে প্রণোদনা হিসেবে[৩] তিনি লিখেছিলেন, এটি ব্যক্তিবিশেষের প্রতিমূর্তির প্রতিফলন বটে, কিন্তু তা অনর্থক নয় কোনোভাবেই। বরং নিষ্ঠুর সমাজসত্যের ক্রমাগত তাড়না থেকেই এরকম চিৎকারের উদ্ভব। তাই *তরঙ্গভঙ্গ* নাটকের আমেনা, জজসাহেব, আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী, মতলুব আলী চরিত্রগুলো প্রচলিত ঘুণেধরা সমাজব্যস্থারই অংশ। বিশেষ করে নাটকের শেষদৃশ্যে তাদের আচরণে সেকথা সুস্পষ্ট হয়। যাদের একটা বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বিত করে কিছুটা সম্প্রকাশবাদী প্রকরণে প্রকাশ করা, লেখকের সুচিন্তিত সমাজভাবনার ফলাফল। এমনকি নাটকের পূর্বের নামগুলোর যেকোনো একটিকে স্মরণে আনলেই নাটকটির সঙ্গে সমাজসংলগ্নতার একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। *আমেনার বিচার* বা *একটি বিচারকের কাহিনী* এই দুটো নামের পরিবর্তে *তরঙ্গভঙ্গ* নামটি দেওয়া অনেকটা প্রকাশকের দাবিতে, এমনটা স্বয়ং ওয়ালীউল্লাহ্‌ই উল্লেখ করেছেন।

৪.

বহিপীর, *উজানে মৃত্যু*, *সুড়ঙ্গ* ও *তরঙ্গভঙ্গ* নিয়ে পর্যালোচনায় দেখা যায়, নাটকগুলোর চরিত্রসমূহ, ঘটনাপ্রবাহ ও গঠনকৌশলে বিচিত্রমাত্রিক পার্থক্য রয়েছে। তবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যভাবনার আকর জায়গা, অর্থাৎ সমকালীন সমাজ ও জনমানুষের জীবনপ্রবাহের গতিধারা, সকল নাটকেই সমানভাবে বহমান। বিষয়ভাবনা ও প্রকরণ-

নিষ্ঠায় স্বরূপসন্ধানী সমীক্ষা পরিচালনাই ছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে তেমন তথাকথিত 'আধুনিক' তিনি এজন্যই নন, কারণ তাঁর লেখায় শুধু ভাঙন, অর্থহীনতা ও নেতির হাহাকার নেই:

> ওয়ালীউল্লাহ্‌র সৃষ্টিশীলতার কেন্দ্রভূমিতে সর্বদাই বসবাস করে এক সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতি। মৃত্যু, ধ্বংস, হতাশা, নৈরাশ্য প্রভৃতির বাস্তবতা তাঁর সাহিত্যে চিত্রিত হলেও পরিণামে এসব আখ্যান এক গভীর মানবিক বোধে উন্নীত হয়। এর কারণ, তাঁর ব্যক্তিচৈতন্যের মর্মমূলেই অবস্থান করে এক সার্থক ও কল্যাণকর জীবনানুভূতি যা তাঁর সৃষ্টিকে আশাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করে। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৭: ১৩৪)

এ 'সার্থক ও কল্যাণকর জীবনানুভূতি'ই তাঁকে শেষপর্যন্ত অ্যাবসার্ডিজম ও সম্প্রকাশবাদিতায় আচ্ছন্ন হতে দেয়নি। *উজানে মৃত্যু* ব্যতীত তাঁর অন্য নাটকগুলোর অন্যতম উপাদান কৌতুক রস। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছলে তিনি যেসব ঘটনার সমাবেশ ও সংলাপের সৃষ্টি করেছেন, তা পাঠকমনে হাস্যরসের উদ্রেক করে বটে; কিন্তু, একই সঙ্গে সমাজকে দেয় তির্যক খোঁচা। এদিকে তাঁর নাটকে নেই অ্যাবসার্ডধর্মিতারও প্রাবল্য। বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৫: ১৯৯) লিখেছেন, ওয়ালীউল্লাহ্‌র কোনো নাটকই বিশুদ্ধ অর্থে অ্যাবসার্ড নয়। বরং, এতে অ্যাবসার্ড-রীতির কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি আছে মাত্র। এছাড়া তাঁর দর্শনভাবনা মানেই সেটা অস্তিত্ববাদ নয়। নাট্যভাবনা বিচারেও সর্বাগ্রে এই কথাটা স্মরণ রাখা জরুরি। মার্কসের দর্শন তাঁকে ভাবিয়েছিল, তবে প্রায়োগিক মার্কসবাদী তিনি ছিলেন না কখনও। অনেকটা 'নব্য-ফ্রয়েডীয়দের মতো' (তানভীর, ২০০০: ৫১) বিপ্লবের চাইতে ব্যক্তিমানুষের মনোজাগতিক পরিবর্তনের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি।

তাছাড়া চারটি নাটকেই মঞ্চনির্মাণ কৌশলের ছোট ছোট ডিটেইলসগুলো (details), নাটকের চরিত্রগুলোর সঙ্গে পাঠকের একধরনের যোগসূত্র স্থাপনে সহযোগিতা করে। ফলে রিডিং প্লে (reading play) না হয়ে নাটকগুলোতে উন্মুক্ত হয় পাঠকের অবাধ যাতায়াতের পথ। উপন্যাসের মতো বহুল-পঠিত হয়নি বলেই হয়তো এ নাটকগুলোকে সমমানে বিচার করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি এখনও। তবে ঘুণেধরা ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করে বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত মোল্লাতন্ত্রের সমালোচনায় তিনি মজিদ কিংবা বড়বাড়ির দাদাসাহেবকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন; বহিপীর কিংবা আবদুস সাত্তার নেওলাপুরীর উপাখ্যানও তেমনি প্রায় অভিন্ন। মোহাম্মদ জয়নুদ্দীনের (২০১৬: ৮৯) মতে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চরিত্রসমূহ, অর্থাৎ বহিপীর, আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী, কলিম প্রমুখ চরিত্রগুলো স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে কুচক্রী হয়ে উঠেছে বটে, তবে তারা কেউই তথাকথিত অর্থে ভিলেন নয়। অতএব, আপাত খল চরিত্রগুলোর মধ্যে বিরাজমান নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহে কোনো অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ছিল না। বরং, এসব প্রতিফলিত হয়েছিল সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার অংশ হয়ে।

পূর্ববাংলার নাট্যমঞ্চ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এসেও নারীদের পদচারণায় মুখরিত হতে পারেনি সেই অর্থে, এটা জেনেই নিজের নাটকগুলোয় তিনি সীমিত রেখেছেন নারী চরিত্রের উপস্থিতি। কিন্তু, একই সঙ্গে সমাজসচেতন ওয়ালীউল্লাহ্ এটাও জানতেন, সামষ্টিক গণচেতনার জোয়ারে নারীরাও ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে প্রতিবাদী ও অধিকার সচেতন। তাই অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মতো নাটকেও সীমিত পরিসরে হলেও তাহেরা, ভিখারিণী, রাবেয়া চরিত্রগুলোর উজ্জ্বল অবস্থান চিহ্নিত করেছেন তিনি। যদিও পরিপার্শ্বের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ক্রমাগত ব্যর্থ হয় তাঁর নাটকের তুলনামূলক কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহ। তবে জাঁ পল সার্ত্রের (১৯৯৩: ৫৬০-৬১) মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তির অস্তিত্ব ও সামাজিক সত্তা রয়েছে মূলত সহাবস্থানে। যে অস্তিত্ব আবার সামাজিক প্রভাবক ছাড়া নিজেকে প্রকাশের ক্ষেত্র পায় না তেমন। তাই উপরিউক্ত নাটকসমূহের চরিত্রগুলোও নিজেদের মনোজাগতিক সত্তা আবিষ্কার ও বিকাশে আশ্রয় নিয়েছিল পারিপার্শ্বিকের ওপর।

৫.

নতুন সংগঠনে নির্মিত নবতর ভাবনাতরঙ্গে মনোলোকের অবরুদ্ধ চেতনা প্রকাশ করলেও ওয়ালীউল্লাহ্‌র অস্তিত্ববাদী চিন্তাজগৎ জুড়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা নয়, ক্রিয়াশীল ছিল সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকামী ভাবনা। বিচ্ছিন্নতা (alienation) ও ঐক্যের (symmetry) অসামান্য সমন্বয়ে এবং অসাধারণ মঞ্চসৃষ্টিকৌশলে, দেশীয় সমাজ-চৈতন্যস্পর্শী নাটকগুলোতে তাঁর দর্শনপ্রসূত বক্তব্য অন্তর্গত সত্যসহ প্রকাশিত। শিল্পের জন্য শিল্প যেমন তিনি লেখেননি, ঠিক তেমনই সমাজ সংস্কারকের ভূমিকাও তাঁর ছিল না। নবধারার নাট্যনির্মাণ প্রচেষ্টায় রত থাকলেও বিষয় হিসেবে কোনো 'চাপিয়ে দেওয়া' বাস্তবতাকে গ্রহণ করেননি তিনি। তাছাড়া, শুধু পাশ্চাত্য জ্ঞানভাষ্য চর্চার উর্বর ভূমি ফ্রান্সে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন, এবং হাইডেগার-সার্ত্রে-কামু-কাফকা দ্বারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলেই তাঁর সাহিত্যগুলোকে কেবল তত্ত্ব প্রয়োগের সামর্থ্য বিবেচনায় বিচার করা পুরোপুরি যৌক্তিক নয়। কারণ, শিল্পী হিসেবে তিনি প্রধানত বাঙালি মুসলমানের সমাজটাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

ঐতিহ্যসন্ধানী মানসের পরিচায়ক ও যুগাতিক্রমী নাট্যকার ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাট্যভাবনা তাঁর জীবনধারা ও অস্তিত্ব-সন্ধানী জীবনজিজ্ঞাসারই নান্দনিক রূপ। সুতরাং, শুধু গুটিকয়েক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকের সমালোচনা এজন্যই হতে পারে না যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও প্রায় সমাজবিচ্ছিন্ন সম্প্রকাশবাদ, অ্যাবসার্ডিজম প্রভৃতি ধারা থেকে তাঁর নাটকের চরিত্রগুলো অনেকটাই ভিন্ন। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নঞর্থকতা প্রকাশিত হলেও নাটকগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ইতিবাচকতার প্রসারের মাধ্যমে অনির্বচনীয় সিদ্ধি অর্জন। মূলত নিজের মানবিক উপলব্ধিকে রূপায়ণের যথাযথ মাধ্যম

হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যকর্মকে। তাই একরৈখিক দৃষ্টিতে নয়; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাট্যচিন্তার প্রকৃত উৎসমুখ অনুসন্ধানে এবং প্রাসঙ্গিকতা যাচাইয়ে, পুনঃপাঠ ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক বিবেচনার কোনো বিকল্প নেই।

টীকা

১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক *বহিপীর* প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। তবে ১৯৫৫ সালে ঢাকায় P. E. N. ক্লাব আয়োজিত আন্তর্জাতিক লেখক-সম্মেলনের বাংলা নাট্যপ্রতিযোগিতায় নাটকটি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিল। *সুড়ঙ্গ* ১৯৫৫ সালে *সংবাদ*-এর স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১৯৬৪ সালে। *তরঙ্গভঙ্গ* নাটকটির নাম প্রথমদিকে ভাবা হয় 'আমেনার বিচার'; এরপর *একটি বিচারকের কাহিনী* নামে ত্রৈমাসিক *সংলাপ* পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। পরবর্তীকালে ১৯৬৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এর নামকরণ হয় *তরঙ্গভঙ্গ*। তাঁর আরেকটি নাটক *উজানে মৃত্যু সমকাল* পত্রিকায় ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হলেও, লেখকের জীবদ্দশায় এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। নাটকটি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ও সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌-রচনাবলী:* ২-তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে উপরিউক্ত তিনটি নাটকের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭ সালে। এ প্রবন্ধে নাটকগুলোর পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত ও প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *নাটকসমগ্রে*র পঞ্চম মুদ্রণ থেকে। যেটি প্রকাশিত হয়েছিল সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে।

২. সাজ্জাদ শরিফ সম্পাদিত প্রথমা প্রকাশন থেকে ২০১৩ সালে প্রকাশিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *অগ্রন্থিত রচনা* গ্রন্থের ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা থেকে বন্ধু হৃষীকেশ লাহিড়ীকে লেখা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিঠির অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো:

'কায়েদে আজমের মৃত্যু অপূরণীয়। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এযাবৎ পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তিত্বদের একজন। কিন্তু তার মহত্ত্ব ছিল প্রধানত এই যে তিনি অধঃপতিত, প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া মুসলমানদের অনিশ্চিত অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে তার স্বধর্মের কোটি কোটি মানুষের স্বার্থের পক্ষে যে বিশেষ অবদান রেখেছেন, সেখানে তার বড়ো মহত্ত্ব।... আমরা, এই উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানরা যদি জাতীয় পর্যায়ে এই উপলব্ধি অর্জনের জন্য আন্তরিকভাবে নিজেদের নিবেদিত করতাম এবং তা অর্জন করতে সক্ষম হতাম, কি সুখী আর গর্বিতই না হতে পারতাম আমরা। পাকিস্তান ও ভারত উভয়ই আজ করুণভাবে খাটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বিচ্ছেদের ভবিষ্যৎ দুঃখজনক, কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবন রক্ষার জন্য এই অস্ত্রোপচার অনিবার্য ছিল। যদি আমরা শুধু এই অস্ত্রোপচারের জরুরি দরকারটাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারতাম।'

৩. এডওয়ার্ড মুঙ্ক তাঁর ডায়রিতে *দ্য স্ক্রিম* চিত্রকর্মটি নিয়ে *Nice 22 January 1892* শিরোনামে লিখেছিলেন:

One evening I was walking along a path, the city was on one side and the fjord below. I felt tired and ill. I stopped and looked out over the fjord -- the sun was setting, and the clouds turning blood red. I sensed a scream passing through nature; it seemed to me that I heard the scream. I painted this picture, painted the clouds as actual blood. The color shrieked. This became *The Scream*.

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১২। *আমার স্বামী ওয়ালী*, শিবব্রত বর্মন অনূদিত, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, ২০১৮। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

আবুল কাশেম চৌধুরী, ১৩৬৮। 'ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক', *পূর্বমেঘ*, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, রাজশাহী।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, ২০০১। *বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা।

কবীর চৌধুরী, ১৯৭১। 'কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্', *দৈনিক পাকিস্তান*, আবুল কালাম শামসুদ্দীন সম্পাদিত, ঢাকা।

কবীর চৌধুরী, ১৯৮৫। *এ্যাবসার্ড নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কবীর চৌধুরী, ২০১১। *প্রসঙ্গ নাটক*, অনন্যা, ঢাকা।

জীনাত ইমতিয়াজ আলী, ২০১৫। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : জীবন দর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

তানভীর মোকাম্মেল, ২০০০। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্যজিজ্ঞাসা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

নীলিমা ইব্রাহিম, ১৩৭৯। *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৫। *নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০১৪। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক নিয়ে', *নান্দীপাঠ*, সংখ্যাঃ ছয়, সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত, ঢাকা।

বেগম আকতার কামাল, ১৩৮৯। 'তরঙ্গভঙ্গ : একটি অভিব্যক্তিবাদী নাটক', *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষঃ ২৬, সংখ্যাঃ ১, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, ২০১৬। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পসৃষ্টি*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন, ১৯৮৮। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০১৭। *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ আবুল মকসুদ, ২০১৫। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*, মনন প্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩। *নাটকসমগ্র*, হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম, ১৯৯৯। 'ওয়ালীউল্লাহ্-সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব', *সমুদ্যত দৈব দুর্বিপাকে*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তকা, ঢাকা।

Esslin, Martin, 2004. *The theatre of the absurd.* Anchor Books, New York.

Guha-Thakurta, P, 2013. *The Bengali Drama Its Origin and Development*, Routledge, London.

Krasner, David, 2012. *A History of Modern Drama*, Volume I, Wiley-Blackwell, West Sussex.

Krasner, David, 2016. *A History of Modern Drama*, Volume II, Wiley, New York.

Sartre, Jean-Paul, 1993. *Being and Nothingness*, Translated by Hazel E. Barnes, Washington Square Press, New York.

Stanska, Zuzanna, 2016. 'The Mysterious Road From Edvard Munch's The Scream', *Daily Art Magazine.*